মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী : তাঁর ভাষা ও সংস্কৃতিচিন্তা

মোরশেদ শফিউল হাসান*

ব্যাপক দেশবাসীর কাছে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পরিচয় শহিদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের ঠিক প্রাক্কালে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী দেশীয় ঘাতক গোষ্ঠীর নিশানা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে যাঁরা প্রাণ হারান, দেশের সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের নিহত তিনজন শিক্ষকের অন্যতম তিনি। প্রতি বছর ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে পত্রিকায় আরো কয়েকজন শহিদ লেখক-শিক্ষক-সাংবাদিক-চিকিৎসক ও অন্য বিশিষ্ট পেশাজীবীর সঙ্গে তাঁরও নাম ও ছবি ছাপা হয়। এর অতিরিক্ত আমাদের উচ্চশিক্ষিত পরিমণ্ডলেও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কৃতি ও কীর্তি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা আছে বলে মনে হয় না। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে : (এক) বিভিন্ন সময় স্বনামে ও বেনামে কিছু গল্প-কবিতা-গান-নাটিকা ইত্যাদি লিখলেও, সৃষ্টিশীল লেখক বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না; (দুই) ছাত্রজীবনে প্রখর মেধাশক্তির পরিচয় দিলেও, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষ ধাঁচের (কবীর চৌধুরী যার উল্লেখ করেছেন 'আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্ব' বলে, আকরম : ৮১) কারণেই হয়তো শিক্ষক হিসেবে তিনি আকর্ষক ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারেননি; (তিন) মানুষ হিসেবে নম্রভাষী শুধু নয়, ছিলেন কিছুটা গোটানো স্বভাবেরও। যদিও আমাদের জাতীয় ইতিহাসের নানা পর্বে, বলা যায়, সকল সমস্যা ও সংকটে, মতামত ও পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ, ক্লান্তিহীন। সেদিক থেকে আমাদের সমাজে তিনি আমৃত্যু একজন সদাজাগ্রত বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শুধু যে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিবিরোধী ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় তিনি কলমযোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন, তাই নয়। কিংবা প্রবন্ধ লেখাতেই তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। সভা-সেমিনারে বক্তৃতা করে, পত্রপত্রিকায় এমনকি চিঠিপত্র কলামে লিখেও তিনি তাঁর মত-মন্তব্য, প্রস্তাব-পরামর্শ এবং কখনো প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কোন বিষয়ে তিনি লেখেননি? শিক্ষাসমস্যা ও তার সংস্কার, রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক, গণতন্ত্রের সংকট, ভারত-পাকিস্তান সম্প্রীতি, নগর পরিকল্পনা (শহরের কেন্দ্রস্থলে স্টেডিয়াম ও মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে ও

---

*অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শিশুদের জন্য পার্ক বা খেলাধুলার মাঠের দাবি জানিয়েও তিনি লিখেছেন), রেল ও সড়ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। আর এ সব বিষয়েই তাঁর যুক্তিবাদী ও কল্যাণকামী মনের সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, এখানে একটি উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর ভারত থেকে আসা মোহাজেরদের জন্য আইয়ুব আমলে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে পৃথক আবাসিক এলাকা নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলে তিনি তার বিরোধিতা করে (One who knows ছদ্মনামে) *Pakistan Observer* পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটিকে কেন্দ্র করে প্রথমে *Morning News* ও পরে তার সঙ্গে তাল দিয়ে *Dawn* প্রভৃতি পত্রিকা অপপ্রচারে নামে। তারা এর মধ্যে মোহাজেরদের স্বার্থবিরোধিতা খুঁজে পায় বা সেভাবে তাকে উপস্থাপন করে। অথচ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্য ছিল, এভাবে মোহাজেরদের জন্য আলাদা উপশহর নির্মাণ স্থানীয় জনগণের সঙ্গে তাদের স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা তৈরি করবে, এবং কোনোদিনই তারা এদেশের মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে পারবে না। ১৯৭১-এ এই সত্যের নিষ্ঠুর প্রকাশ কি আমরা দেখতে পাইনি? মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিনি?

২

ছাত্র হিসেবে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন দারুণ মেধাবী। বরাবরই পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। নোয়াখালির প্রায় অখ্যাত একটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে কলা বিভাগে প্রথম হন। এমন ছাত্ররা সাধারণত জীবনের গতিপথ নির্ধারণে যে স্বপ্ন বা সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হন, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বেলায় গোড়া থেকেই তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ পরিবেশে ও ততোধিক সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও কিশোর বয়সে তাঁর মনে সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়, তার প্রভাবে স্বপ্ন দেখেন বাংলায় অনার্স পড়বেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগের পেছনে বাবা-মা ও কয়েকজন শিক্ষকের প্রভাব যেমন, তেমনি বোধহয় তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাবও কাজ করেছিল। কলকাতায় গিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজেই পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওই কলেজে তখন বাংলায় অনার্স পড়ার ব্যবস্থা ছিল না বলে ভর্তি হন তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে। অবশ্য স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্রাবাস সুবিধা না থাকায় তাঁকে আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে ইংরেজি অনার্স ক্লাসে ভর্তি হতে হয়। তবে মোফাজ্জলের কলেজ জীবনের প্রিয় শিক্ষক জনার্দন চক্রবর্তীর (ততদিনে যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিয়েছেন) কাছ থেকে তাঁর মনোবাঞ্ছার কথা জানতে পেরে প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অপূর্ব কুমার চন্দ তাঁর শান্তিনিকেতনে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। অপূর্ব কুমার চন্দের ছোটোভাই অনিলকুমার চন্দ সে সময় শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। এভাবেই

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতনে বাংলায় অনার্স পড়তে শুরু করেন। শান্তিনিকেতনে প্রবোধচন্দ্র সেনকে তিনি তাঁর অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলেন; হয়ে উঠেছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য। ১৯৪৬ সালে মোফাজ্জল চৌধুরী যখন বাংলা অনার্স পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তখন শিষ্য-গর্বে গর্বিত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর নামকরণ করেন 'মুখোজ্জ্বল হায়দার'। মোফাজ্জল চৌধুরীর আগে আর কোনো মুসলমান ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেননি। তাঁর এ কৃতিত্বের খবরটি সে সময় *স্টেটসম্যান*, *আনন্দবাজার*, *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, *অমৃতবাজার*, *যুগান্তর* প্রভৃতি পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। পরেও, এমনকি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত. ওই পরীক্ষায় তাঁর সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার রেকর্ড কেউ ভাঙতে না পারায় সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁকে স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয় (মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর পক্ষে তাঁর ছোটোভাই লুৎফুল হায়দার চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন)। অনুষ্ঠানে উপাচার্য তাঁর ভাষণেও বিশেষভাবে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর নামোল্লেখ করেন।

সে সময় বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদের সর্বশেষ পরীক্ষাটিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষার সমমানের মনে করা হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডিগ্রিটির অনুমোদন ছিল না। যে কারণে প্রবোধচন্দ্র সেন ও অনিল চন্দ উভয়েই চেয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় ও মেধাবী এই ছাত্রটি অতঃপর এমএ পড়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হোক। মোফাজ্জল ভর্তি হয়েছিলেনও এবং একবছর (১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে) সেখানে পড়াশুনা করেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন থেকে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ তাঁর পছন্দ হয়নি। ক্লাসগুলোকে মনে হয়েছে অনাকর্ষণীয়, শিক্ষার মানও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি (দিনপঞ্জিতে লিখেছেন এসব কথা)। উপরন্তু দেশভাগজনিত পরিস্থিতি, কলকাতায় থাকা-খাওয়ার সমস্যা, নিজের আর্থিক সংকট ইত্যাদি সব মিলিয়ে তাঁর মানসিক অবস্থাটা তখন কলকাতায় অবস্থানের অনুকূল ছিল না। এ সময় কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আশরাফ সিদ্দিকীকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমার খুব সম্ভব থাকা হবে না কলকাতায় – এবং আসছি, ... শান্তিনিকেতনেই।" (*মো.হো.চৌ.র./২,পৃ. ২৪৭*) ১৯৪৮ সালে বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় হয়ে সাহিত্য ভারতী উপাধি লাভ করেন। এরপর বিশ্বভারতীতেই তিনি প্রবোধচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন (তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'বাঙলা গীতিকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ')। কিন্তু একদিকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি, অন্যদিকে শীঘ্রই পাসপোর্ট-ভিসা প্রবর্তনের ফলে দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত

কঠিন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে আপন দেশ, সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়বোধ থেকে তিনি ঢাকায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৯ সালের ১১ মে শান্তিনিকেতন থেকে আশরাফ সিদ্দিকীকে এক চিঠিতে তিনি যা লিখেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> শান্তিনিকেতনকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি। এখানে শান্তিতে এবং আনন্দে আছি। এ যায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে আমার ভবিষ্যৎ কী? তাছাড়া আমি জানি আমার কর্মক্ষেত্র আমার স্বদেশে, ঢাকায়। সেখানে আমার অনেক কিছু করবার এবং দেবার আছে। ... (*মো.হো.চৌ.র.*/২, পৃ. ২৬১-৬২)

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী শান্তিনিকেতন ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। কিন্তু কলকাতার মতো ঢাকাতেও যেহেতু বিশ্বভারতীর সাহিত্য ভারতী ডিগ্রির স্বীকৃতি ছিল না, ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকরি হয়নি। শান্তিনিকেতনের সুবাদে পরিচিত শামসুল হুদা চৌধুরী তখন রেডিও পাকিস্তানের কর্মকর্তা। তিনিই তাঁকে রেডিওতে স্ক্রিপ্ট রাইটারের একটা চাকরি জুটিয়ে দেন। বছরখানেক সে চাকরি করেছিলেন মোফাজ্জল। পরে তা ছেড়ে জগন্নাথ কলেজে ও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে সেন্ট গ্রেগরিজ (বর্তমানের নটর ডেম) কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাঁর রেডিওর চাকরি ছাড়ার পেছনেও একটা কাহিনি আছে। পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে অফিস করা যাবে না, একথা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সে চাকরিতে ইস্তফা দেন। (আকরম : ৭০) বিশ্বভারতীর সনদ উপেক্ষিত হওয়া নিয়ে তাঁর মনে দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল; দ্বিধা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন করে মাস্টার্স ডিগ্রি নেয়ার ব্যাপারে। বলা বাহুল্য তাঁর আত্মসম্মানবোধ এতে সায় দেয়নি। তারপরও বাস্তবতা বিবেচনায় ও স্বজন-শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ-উপরোধে যখন তিনি অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রথম পর্বে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম এবং শেষপর্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফলে এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ লাভে তাঁর আর কোনো বাধা থাকে না। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগ দেন।

আপাত নমনীয়তার আড়ালে মোফাজ্জল চৌধুরীর চরিত্রের এই অন্যদিকের পরিচয় আমরা তাঁর পরবর্তী জীবনের আরো দু-একটি ঘটনা বা সিদ্ধান্ত থেকেও পাই। যেমন ১৯৫৭ সালে তিনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ডে যান এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু দু'বছর অধ্যয়ন ও গবেষণার পর অধ্যাপকের সঙ্গে মতান্তরের কারণে দেশে ফিরে আসেন। এটাও আমাদের মতো উন্নয়নশীল বা তখনকার অভিধা অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের একজন বিদ্যার্থী বা গবেষকের পক্ষে ছিল একটি ব্যতিক্রমী ধরনের ঘটনা। যার উল্লেখ করতে গিয়ে

সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন, "এই ঘটনা এদেশে তাঁর সম্মানকে ক্ষুণ্ন করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ এ ব্যাপারে তাঁকে অতিভাবপ্রবণ বলে অভিহিত করেছেন।" জীবনে যেমন কাছের মানুষও অনেকে তাঁকে বুঝতে পারেননি, মৃত্যুর পরও তেমনি আমাদের বিদ্বৎসমাজে তাঁর বিষয়ে একটা অপরিচয়ের আড়াল যেন রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আবারও সন্‌জীদা খাতুনকে উদ্ধৃত করছি :

> ... ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ছিলেন সবার সুদূর। ... একাকিত্ব তাঁকে বরাবর একটি দ্বীপের নিঃসঙ্গতায় ঘিরে রেখেছিল। মোফাজ্জলের কতিপয় পরিচিতজনকে তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছি – কুঁকড়ে থাকা পোশাকি মানুষটাকেই দেখলাম কেবল; ভিতরটা কিছুতেই জানা গেল না। কে জানে – অন্তরের মানুষটিকে খুঁজেছিলেন নাকি তাঁরা; কিংবা তাঁর স্বভাবের মৃদুতাকে দুর্বলতা ভেবে তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন।
>
> অনেকেই মনে করেন চরিত্রের দৃঢ়তা বা বলিষ্ঠতার প্রকাশ রুদ্র আচরণে। প্রবল চিৎকার, ক্রুদ্ধ আস্ফালন, এবং যাবতীয় মনোভাবের সরব ঘোষণাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয়। ভদ্র মার্জিত আচরণ, নম্রতা, স্বাভাবিক বিনয়াদি, চারিত্রিক মাধুর্য হাস্যকর মেয়েলীপনা মাত্র। আমাদের সমাজের বিবেচনায় রঘুপতিই নায়কোচিত গুণের অধীশ্বর, গোবিন্দমাণিক্য তুচ্ছ পাঁঠাবলির ইংগিতে কাতর এক দুর্বল চরিত্র অযোগ্য রাজা। রাবণের মত চিৎকার ক'রে আপন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা না করলে, ক্ষমতাদম্ভে নিয়ন্ত্রিত সমাজে চারিত্রিক সবলতা প্রচার হয় না। মোফাজ্জল হায়দার রাবণিক আস্ফালনে অপারগ ছিলেন। (আকরম : ৭৮-৭৯)

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল মনের, সহানুভূতিশীল, ছাত্রবৎসল। সহকর্মী ড. নীলিমা ইব্রাহিম লিখেছেন, 'মোফাজ্জল হায়দার যখন গাড়ী চালিয়ে যেতেন তখন তাঁর কোনও পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই গাড়ীতে কখনও তাঁকে একা দেখিনি। বহু ছাত্রছাত্রীকে অবলীলাক্রমে সঙ্গী করে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে বহন করেছেন।' (আকরম : ৪) স্বজন-বন্ধু-সহকর্মী-পরিচিত যে কারো বিপদে-আপদে এগিয়ে যেতেন। সাধ্যমতো সহায়তার চেষ্টা করতেন। এমনকি তার জন্য ঝুঁকি নিতেও পিছপা হতেন না। ছিলেন শান্তিনিকেতনের কৃতী ছাত্র, সেই সূত্রে সেদেশে অনেকেরই পরিচিত ও প্রিয়পাত্র। ১৯৭১-এ সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলে, আমাদের অনেক সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদের তুলনায় তিনি সেখানে বেশি বৈ কম সমাদৃত হতেন না। কিন্তু আপন স্ত্রী-সন্তান ও সম্প্রসারিত পরিবারের সদস্যদের অসহায় ফেলে রেখে তিনি কোথাও যেতে চাননি। কিন্তু একাত্তরের ওই অবরুদ্ধ সময়েও তিনি যা করেছেন তাও যুদ্ধের চেয়ে কম ছিল না। কারারুদ্ধ সহকর্মী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মুক্তির জন্য তিনি নানা জায়গায় যোগাযোগ ও চেষ্টা-তদ্বির করেছেন। আর তিনি তা করেছেন স্বপ্রণোদিতভাবেই। খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছেন আত্মগোপনকারী ছাত্রদের। সে সময়,

সবাই যখন আপন প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত, তখন এসব প্রচেষ্টার ঝুঁকি বলা বাহুল্য, সামান্য ছিল না। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের সঙ্গে যুদ্ধকালীন এই সক্রিয়তাও হয়তো তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। শান্ত-নম্র ব্যক্তিত্বের আড়ালে তাঁর এই উপচিকীর্ষু মন, কর্তব্যবোধ থেকে ঝুঁকি নেবার সাহস, তাঁর জীবনকালে যেমন, আজও তেমনি প্রায় অনুল্লেখিতই রয়ে গেছে। নিজেকে জানান দেয়ার ব্যাপারটি তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা বা দায়িত্ববোধ এবং তা পালন করতে গিয়ে ঝুঁকি নেবার সাহসের পরিচয় আমরা তাঁর রচনার মধ্যেও পাই।

৩

উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এবং আরো বিশেষ করে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতার পর ১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ বাঙালি মুসলমান লেখকদের প্রায় সকলেই পাকিস্তান দাবির সমর্থক হয়ে পড়েন। তাঁরা মনে করেছিলেন এর মধ্যেই উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মোটামুটি সমাধান এবং পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের আত্মবিকাশের সম্ভাবনা নিহিত আছে। ফলে ১৯৪৭ সালের মধ্য-আগস্টে যখন ভারত ভেঙে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন দু-তিনজন বাদে তাঁদের সকলেই যথেষ্ট আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে এই নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীও যে এর ব্যতিক্রম ছিলেন না তার প্রমাণ তাঁর এই বক্তব্য : 'পাকিস্তান আন্দোলন আমাদের জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের মনে এক নতুন ভাব-বাদের জন্ম দিয়েছে।' (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ২৬১) বাংলা বিভক্তির ফলে পূর্ব বাংলার (তিনি অবশ্য তাঁর লেখায় 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন) মুসলমানরা 'সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিকে তাদের নিজস্ব আদর্শ ও পন্থানুযায়ী বিকাশের এক নিরঙ্কুশ সুযোগ লাভ করবে' আর সেই সুযোগ এক 'নতুন ও বিপুল সম্ভাবনার জন্ম দেবে' এমন আশা ও বিশ্বাসের কথাও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ৩৪১)

অবশ্য, আরও কারো কারো মতো, তিনিও সেদিন আশা করেছিলেন, পাকিস্তান হবে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিভাগপূর্ব ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন এ রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বা বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। এ ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে দেওয়া বক্তৃতা তাঁদের মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। যদিও তাঁদের সে আশাবাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী বিজয়ের (মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক শাসন ও সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী শোষণের পটভূমিতে যে-ঘটনাকে তাঁর কাছে রীতিমতো 'বিপ্লব' বলে মনে হয়েছিল)

পর দৈনিক *মিল্লাত* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ('গণতন্ত্রের পথে এক ধাপ-২') মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এ বিষয়ে তাঁর আক্ষেপ ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন :

> ... রাষ্ট্র যদি গণতন্ত্র হয়, তবে তার কাছে কে হিন্দু কে মুসলমান, এ প্রশ্নই উঠতে পারে না। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র হলে সেটা গণতন্ত্র হবে না; আর গণতন্ত্র হলে ইসলামী রাষ্ট্র বলার কোনো মানে হয় না। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম একথা বুঝিয়াছিলেন। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঠিক পরেই গণপরিষদ উদ্বোধন করিবার সময় তিনি বলেছিলেন, "আজ থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থে এ রাষ্ট্রে কেউ হিন্দু বা মুসলমান নেই, সকলেই এখানে শুধু নাগরিক – যাদের সকলের থাকবে সমান অধিকার।" ... কোনো বিশেষ ধর্মতন্ত্র সম্বন্ধে কায়েদে আযমের উদ্ধৃত উক্তিটি একেবারেই খাটে না। (*মো.হা.চৌ.র.*/২, পৃ. ৫৮)

ভারতভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে ধর্ম ততটা নয়, যতটা কাজ করেছিল অর্থনৈতিক কারণ ও রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতা, অপর কারো কারো মতো মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীও এমন অভিমত পোষণ করতেন। এ বিষয়ে অন্য এক প্রবন্ধে ('সংস্কৃতি সংকট') তাঁর বক্তব্য : 'পাকিস্তান কেন হয়েছে তা সবাই জানেন। আমরা জানি যে সেটা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার। ... পাকিস্তানে যারা বাস করে ধর্ম দ্বারা তাদের জাতীয়তা নির্ধারিত হবে না, সে কথা কায়েদে আজমই বলে গেছেন।' ইত্যাদি। (*মো.হা.চৌ.র.*/১, পৃ. ৩৭০) একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণের নীতির অপরিহার্যতার কথা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর সমসাময়িক অন্য যে কোনো লেখক-সাহিত্যিকের চেয়ে বরং অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। শুধু যে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর লেখা পূর্বোক্ত 'গণতন্ত্রের পথে এক ধাপ' শীর্ষক প্রবন্ধেই তিনি 'আমরা আধুনিক যুগের, বিংশ শতাব্দীর নাগরিক। আমরা আমাদের রাষ্ট্রকেও দেখতে চাই আধুনিক রাষ্ট্ররূপে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভাঁওতা দিয়ে আমাদের কেউ আধুনিক রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে এ আমরা সহ্য করব কেন?' – এমন কথা উচ্চারণ করেছেন, তাই নয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বিল গণপরিষদে উত্থাপনের প্রাক্কালে দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ('রাষ্ট্র ও ধর্ম') লিখেছিলেন :

> রাষ্ট্রকে ধর্মীয় করবার বিপদ অনেক। তাতে যে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয় শুধু তাই নয়, অনাচারেরও সৃষ্টি হয়। কেননা, রাষ্ট্র-নিয়ামকগণ যাই করুন, তাই ধর্মবিধানের সামিল বলে স্বীকৃত হওয়ার ফলে স্বাধীন বিচারের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। ... রাষ্ট্রের পেছনে ধর্মতন্ত্রের সমর্থন থাকলে রাষ্ট্রের কর্তারা তাদের স্বীকৃত সমস্ত অন্যায়কেই 'ধর্মীয়' বা ধর্মনীতি বলে চালিয়ে দেবার ও অব্যাহত রাখার সুযোগ পান। এটা সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে খুবই দুর্ভোগের কারণ হতে পারে। যেমন আমাদের দেশে বলা হয়, যারা সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধেই কথা বলে, কেননা পাকিস্তান ইসলামী-রাষ্ট্র। অতএব তারা ধর্মদ্রোহী, ইসলামের শত্রু। এখন, দেশের লোকেরা একদিকে অত্যাচারিত হয়ে অপরদিকে কিছু বলতে গেলেই

> ধর্মদ্রোহী বলে পরিচিত হবে, এ নিশ্চয়ই বড় অসহনীয় অবস্থা। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ৭২-৭৩)

তবে, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতো মানুষরা যাই ভাবুন বা বলুন, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে দেশটিকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হিসেবেই ঘোষণা করা হয়। আর ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে ওভাবে যিনি বলতে বা লিখতে পারেন, ব্যক্তি জীবনে যতই নম্র স্বভাবের বা 'অজাতশত্রু' মানুষ তিনি হন, ১৯৭১-এ ধর্মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারীদের জিঘাংসার লক্ষ্য যে তিনি হবেন, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। অন্য কারো পক্ষে যদি বা সে দুর্ভাগ্য এড়াবার সম্ভাবনা থাকেও, তাঁর মনে হয় ছিল না।

৪

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মাথায় (১৯৪৭ সালের ১৮ নভেম্বর) শান্তিনিকেতন থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে লিখিত এক চিঠিতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির প্রতি তাঁর সমর্থন এবং আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানান। চিঠিতে 'পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি লেখেন, 'নিজের মাতৃভাষায় রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনা করিব – ইহা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার; বস্তুত সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসাবে বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও ব্যবহারের ভাষা (Lingua Franca) হওয়া উচিত।' চিঠিতে এ ব্যাপারে পাকিস্তান গণপরিষদের বাঙালি সদস্যদের 'আরও আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং দৃঢ়' ভূমিকা তিনি কামনা করেছিলেন। (*মো.হা.চৌ.র./*২, ২৩৩)

১৯৫৩ সালে (তিনি তখন ঢাকায়, এবং জগন্নাথ ও সেন্টগ্রেগরিজ কলেজে শিক্ষকতা করছেন) পূর্ব পাকিস্তানের সদ্য বিদায়ী গভর্নর ফিরোজ খান নুনের আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করে *যুগের দাবি* পত্রিকায় তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন। ঢাকা থেকে লাহোরে ফিরে গিয়ে ফিরোজ নুন সে সময় বলেছিলেন, বাঙালিরা যদি আরবি হরফে বাংলা লিখতে রাজি থাকে তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। এই প্রস্তাবের পেছনের অভিপ্রায়টি শনাক্ত করে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মন্তব্য : 'নূন সাহেবের আসল উদ্দেশ্য কি তিনি নিজেই আভাসে বলে ফেলেছেন : বাংলা ভাষায় একবার কোনোমতে উর্দু হরফ ঢোকাতে পারলে ভাষাটা আপনি ঘায়েল হয়ে যাবে।' (*মো.হা.চৌ.র./*২, ১৬৯) দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছিলেন, 'আরবী অক্ষর প্রবর্তনের নামে বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য কৌশলপূর্ণ অপচেষ্টাকে আমাদের রুখতেই হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল বাঙালী অধিবাসীদের আমরা এ বিষয়ে সতর্ক ও সক্রিয় হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

(*মো.হা.চৌ.র./২*, ১৬৯) ১৯৫৪ সালে *মিল্লাত* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা ভাষার কথা' প্রবন্ধেও তিনি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাঁদের এদেশীয় অনুসারীদের বাংলা ভাষা বিরোধী প্রচারণা – বিশেষ করে বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসের মোকাবিলা করতে গিয়ে লেখেন যে, এক হাজার বছর আগে, সংস্কৃত থেকে নয়, বরং 'পাকিস্তানের মাটিতে'ই প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বাংলার মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি মুসলমান কবিদের হাতে বাংলা মানবীয় সাহিত্যের পত্তনের সগৌরব উল্লেখ করে লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুটি কথা চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।' (*মো.হা.চৌ.র./২*, ১৭৫-৭৬)

৫

রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র সাহিত্যের কথা বাদ দিলে, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রধান আর যে বিষয়গুলো নিয়ে ভেবেছেন ও লিখেছেন তার অন্যতম হলো ভাষা ও সংস্কৃতি। আর সময়ের দাবিতেই ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্কের প্রসঙ্গটি তাঁর আলোচনায় বারবার এসেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনাকে প্রধানত এই বিষয়গুলোতেই কেন্দ্রীভূত রেখেছি। আর তাঁর ইংরেজি রচনাগুলোকে বাদ দিয়েই এ আলোচনা। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে সংস্কৃতি হলো জাতি ও সমাজের মুখশ্রী। মানুষের দেহের লাবণ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'সমাজ-দেহের তেমনি এই সংস্কৃতি'। (*মো.হা.চৌ.র./২*, পৃ. ১৯৫) সংস্কৃতির একটি বিশ্বজনীন রূপ আছে, একথা স্বীকার করেও তিনি তার স্থানীয় বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা ভিত্তিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, সংস্কৃতি জিনিসটাই 'স্থানীয়, আঞ্চলিক'। (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ২৬৪) পাকিস্তানোত্তরকালে যাঁরা তথাকথিত ইসলামি তমুদ্দুনের বিপরীতে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চাকে দাঁড় করিয়ে শেষোক্তের গতিরোধ করার চেষ্টা করেন তাঁদের বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরে তিনি লিখেছেন :

> ... ইসলামী সংস্কৃতি বা Islamic Culture-এর কথাই যদি বলেন তবে সে সংস্কৃতি কি অন্য সংস্কৃতি অর্জনের (assimilation) পথে অন্তরায় বা পরিপন্থী? ... যুগে যুগে কি ইসলামী সংস্কৃতির প্রবাহ বিভিন্ন বিদেশী বা বিজাতীয় ধারাকে আত্মস্থ করে পুষ্ট হয়ে ওঠেনি? প্রাচীন আরবের, ইরানের, মিশরের, স্পেনের কি ভারতের সংস্কৃতির উপনদী এসে কি মেশেনি এই মহানদীর বিপুল প্রবাহে? ... তারপর গোড়াতে ইসলামী সংস্কৃতির মূলেও কি প্যাগান গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান, এমনকি যে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারই এই তমদ্দুনের অভিবাবকদের প্রধান মূলধন তাদের অর্থাৎ সেই হিন্দুদের প্রাচীন বিদ্যার প্রভাব কার্যকরী ছিল না?

> ... যদি 'বিজাতীয়'ই হয় ... তাকে জাতীয় করে নিতে দোষ কী? অগ্নিপূজক রাজাদের কাহিনীতে ভরা শাহনামাকে এমনকি, তার অন্তর্গত বীরদের তো (রোস্তম, সোহরাব) একদিন তাই করে নিয়েছিল। তবে যুধিষ্ঠির বা অর্জুনকেই বা স্বীকার করে নিতে পারবে না কেন? (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ৩৭২)

ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে এই বিরোধ-বিতণ্ডা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী একে দেখেছেন 'একটা অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন চিন্তার ফল' হিসেবে। আর 'সেই আচ্ছন্নতার মূলে রয়েছে একটা ভুল অনুসিদ্ধান্ত (হাইপোথিসিস) – ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।' (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ৮১)

৬

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর আগ্রহের একটি প্রধান বিষয় ছিল ভাষাতত্ত্ব। সেই আগ্রহ থেকেই ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আবদুল হাই তাঁকে উৎসাহিত করেন। কিন্তু SOAS-এ দু বছর অধ্যয়ন এমনকি অভিসন্দর্ভ রচনার পরও (তাঁর অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল Some Supra-Segmental Phonological Features of Bengali) তিনি ডিগ্রি না নিয়েই দেশে ফিরে আসেন, যে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই ফিরে আসার কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সহকর্মী ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য থেকে :

> মোফাজ্জল হায়দার আমেরিকার ভাষাতত্ত্ব চর্চার অগ্রগতিতে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর লন্ডনের অভিসন্দর্ভে আমেরিকান ভাষাতত্ত্ববিদদের অনেক উল্লেখ আছে। বিলেতের অধ্যাপকদের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর মতান্তরও হয়। এ মতান্তরের ফল শুভ হয়নি। (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. উনিশ)

দেশে ফিরে এসেও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ভাষা-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও চর্চা অব্যাহত রাখেন (এ পর্যায়েও তিনি একবার ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর বিদ্যার্জনের জন্য আমেরিকা যেতে সচেষ্ট হয়েছিলেন)। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতিগত কারণে তাঁকে ভাষার কাঠামোগত ও তাত্ত্বিক দিকের পরিবর্তে বাংলা বানান ও লিপি বিষয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে – কথা বলতে ও লিখতে হয়। আর সেসব রচনার বড় অংশটাই ছিল বিতর্কমূলক; যেগুলো পাকিস্তানি শাসক ও পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের ভাষা, হরফ, বানান ও লিপি সংস্কার প্রয়াসের মোকাবিলায় লেখা। বিদেশি ডিগ্রির জন্য যেমন তিনি সেখানকার শিক্ষকের মতের সঙ্গে আপস করেননি, তেমনি দেশেও ভাষা বা বানান সংস্কারের সরকারি প্রচেষ্টার মোকাবিলায় নিজের যৌক্তিক অবস্থানকে বারবার সবলে তুলে ধরেছেন। এমনকি যখন তিনি সরকারের গঠিত বাংলা একাডেমি বানান ও লিপি সংস্কার উপকমিটির সদস্য তখনও।

ভাষা ও বানান সংস্কারের প্রশ্নে 'পরিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মন, সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শান্ত ও অনাহত চিত্ত নিয়ে' সমস্যাটিকে বিচার করার কথা বলেছেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। নিজেও তিনি 'যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ও শিক্ষাব্রতীর অপক্ষপাত মন নিয়ে' বিষয়টি বিবেচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে 'উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দেওয়া' এবং রাজনীতির উর্ধ্বে থাকার কথাও বলেছেন তিনি। কারণ, তাঁর মতে 'এগুলি রাজনৈতিক বিষয় নয় – ভাষাবিজ্ঞানের ও কিছুটা সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা'। আর 'যুক্তি ও তথ্যনির্ভর আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় মতবাদ বা বিদ্বেষের স্থান নেই।' (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ১২১) লেখার দিক থেকে বাংলা বর্ণমালার 'বেশ জটিলতা' এবং পড়ার ক্ষেত্রেও 'কিছুটা অসুবিধা' স্বীকার করে নিয়েও (যুক্তাক্ষর বাহুল্যকেই তিনি এর জন্য দায়ী করেছেন) তিনি যে-কথাটা মানতে নারাজ তা হলো ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলা শেখা সময় ও আয়াস সাপেক্ষ। এ জাতীয় মত-মন্তব্যকে তিনি 'আচ্ছন্ন ইংরেজি মানসিকতারই ফল' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, 'যুক্তাক্ষর বাদ দিলে বাংলা হরফের চেহারা জটিল তো নয়ই, বরং অন্যান্য ভাষার তুলনায় সরলই বলতে হবে।' (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ১২২-২৩) বাংলা লিপি ও বানান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তিনি একেবারে অস্বীকার করেননি। বরং 'কয়েকটি ব্যাপারে' এর 'বাঞ্ছনীয়তা'র কথা বলেছেন। তবে সেই সঙ্গে এও বলেছেন, 'চিন্তা করে দেখা দরকার যে, এ জাতীয় সংস্কার প্রকৃতপক্ষে সম্ভব কিনা এবং তার ফলে আমরা কোন্ কোন্ দিক থেকে লাভবান হতে পারি বা আদৌ লাভবান হতে পারি কিনা।' এ বিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিমত হলো : (১) বানান ও উচ্চারণে বৈষম্য নিরসন, (২) চিহ্ন বা বর্ণের স্বল্পতা, (৩) লিখন সৌকর্য এবং (৪) সুখপাঠ্যতা – 'এর যে-একটি বা একাধিক দিক থেকে যদি বিশেষ সুবিধা হবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই কোনো ভাষার লিপি ও বানান সংস্কারের প্রস্তাব করা কর্তব্য। নচেৎ নয়।' (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ১২৪) বাংলা ভাষায় আরবি বা উর্দু হরফ প্রবর্তন প্রয়াসের বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন, এর ফলে বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ১৬০)

বৈজ্ঞানিক বিচারেও, অর্থাৎ ভাষার উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতার কারণেও, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আরবি বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার অসম্ভাব্যতা এবং এই প্রয়াসের বিপজ্জনক দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ও আরবী ভাষা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। ... ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে এই সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি ও পরিণতি ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। ... তার জন্য এই দুই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না।' (*মো.হা.চৌ.র./২*, পৃ. ১৭০) আরবি হরফ প্রবর্তন প্রয়াসীদের দূর-অভিসন্ধি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'এক কথায়, বলতে গেলে, বাংলা ভাষা উর্দু অক্ষরে লিখতে গেলে বাংলা ভাষা আর বাংলা

থাকবে না, গোটা ভাষাটাই উর্দু হয়ে যাবে। তাছাড়া তখন নতুন নতুন উর্দু এবং আরবী, ফারসী শব্দ উর্দুতে লিখিত 'বাংলায়' আনতে আর কোনই বাধা থাকবে না এবং এর ফলে কালক্রমে বাংলা ও উর্দু ভাষায় আর কোনই পার্থক্য থাকবে না।' (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১৭১)

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে মনে হতে পারে, ভাষা বা বানান সংস্কারের প্রশ্নে মোফাজ্জল হায়দারের অবস্থান ছিল মোটের ওপর রক্ষণশীল। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষয়টিকে দেখেছেন যৌক্তিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। এ ব্যাপারে নিজেকে তিনি যেমন 'কিছুটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী' বলেছেন, (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১৬২) তেমনি দাবি করেছেন একজন 'সংস্কারপন্থী' বলেও। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১৮৩) আগেই বলেছি, বাংলা বানান ও লিপির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা – জটিলতা বা অসুবিধার কথা তিনি স্বীকার করেছেন; মনে করেছেন এগুলোর নিরসন করা গেলে ভালো হতো। তবে তাঁর মতে এগুলোর সংস্কার তখনই করা যেতে পারে, যদি তা আমাদের জন্য লাভজনক হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আজকের দিনেও বিশেষ মনোযোগে নেয়া উচিত বলে মনে করি :

> যদি প্রস্তাবিত সংস্কারের সুবিধা বর্তমান অসুবিধার বাটখারার চাইতে ওজনে যথেষ্ট ভারী না হয়, তবে বর্তমান অসুবিধা মেনে নিয়েও সংস্কারের চেষ্টা পরিহার করাই কর্তব্য। যেমন ইংরেজির বেলায় হয়েছে। শুধু একটা 'নতুন কিছু করো'-র জন্যই যেন ভাষা বা বানান সংস্কারের চেষ্টা না করা হয়। কারণ, সংস্কার করতে গেলে অনেক ভাঙ-চুর ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ; সংস্কারজনিত লাভের দ্বারা যদি সে ক্ষতি পুষিয়ে না যায় তবে সে সংস্কারকে অমঙ্গলজনকই বলতে হবে। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১২২)

ভাষার ক্ষেত্রে তথাকথিত বিশুদ্ধতা রক্ষা কিংবা বানানের ব্যাপারে মূলানুগ হওয়ার ধারণাটিকেও তিনি এই বলে নাকচ করে দিয়েছেন :

১. বিশেষ করে যে শব্দগুলি দীর্ঘকাল বাংলা ভাষায় চলতে চলতে প্রায় বাংলা হয়ে গেছে, সেগুলিকে এমনি শুদ্ধিকরণের চেষ্টা ভয়ানক বাড়াবাড়ি। ইংরেজী ভাষা থেকে আগত শব্দগুলিকে – টেবিল, ইস্কুল, বাক্‌সো, গেলাস, লণ্ঠন, লাট, পুলিশ, গারদ, আপিস – এভাবে বিকৃত করে লিখছি বলে তো কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি; বা ইংরেজরাও তাদের ভাষাকে অপবিত্রকরণের জন্য আমাদেরকে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে না। তবে আরবী-ফারসী শব্দগুলির বেলাতেই বা এত মাথা ফাটাফাটি কেন? প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব প্রকৃতি বা ধারা (genius) থাকে। সে প্রকৃতি অনুসারে সে অপর ভাষার শব্দকে আত্মসাৎ করে নেয়, অর্থাৎ গ্রহণ করার সুবিধে মাফিক বদলে নেয়। ... যদি মূল শব্দের উচ্চারণ অবিকৃত রাখবার ওপর

জোর দেওয়া যায়, তাহলে ভাষায় নূতন শব্দ আমদানীর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১৮০-৮১)

২. কোনো শব্দ চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে তার একটা বানানের রীতি দাঁড়িয়ে যায়, তারপর সেটা বদলাবার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র। একথাটি আমাদের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝতে পারেন না বলে বিশুদ্ধ বানানের জন্য হৈ চৈ করে প্রচুর বিশৃঙ্খলা এবং একটা অহেতুক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১৮২)

একেবারে শেষদিকে (১৯৭০) লেখা দুটি প্রবন্ধে ('মোদের গরব মোদের আশা' ও 'আ মরি বাংলা বাংলা ভাষা') মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী অবশ্য বাংলা বানান ও লিপির কিছুটা সংস্কারের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। মত ব্যক্ত করেছেন যে, বাংলা ভাষার প্রধান শক্তি যেমন এর সম্প্রসারণশীলতা ও শব্দ গঠনের ক্ষমতা, তেমনি এর প্রধান বাধা হচ্ছে লিপির জটিলতা। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ২০৭) একটি মাত্র 'অ'-কার চিহ্ন প্রবর্তন করে এই লিপি-জটিলতা নিরসন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁর পুরনো মত পুনর্ব্যক্ত করে তিনি লিখেছেন, 'এই সামান্য চিহ্নটি প্রবর্তন করলেই আমাদের লিপিপদ্ধতির সমস্ত প্রধান গোলযোগ নিরসন হয়ে যায় – যুক্তবর্ণের জটিলতা দূর হয় এবং আমাদের লিখন পদ্ধতি আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান সম্মত বা alphabetical হয়।' (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ২১০)

বাংলা বানান ও লিপি সংস্কারের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত বিদ্বৎসমাজের (তিনি 'সুধী ও লেখক' কথাটি ব্যবহার করেছেন) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত বলে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মত ব্যক্ত করেছেন। স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন, 'একক বা দলীয় প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাছাড়া সরকারের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়।' (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ১৮৫)

বাংলা বানান ও লিপির জটিলতা এবং ব্যাকরণের কঠিনতার অজুহাত দিয়ে যাঁরা বাংলা ভাষা শিক্ষার বিরোধিতা বা তাকে নিরুৎসাহিত করেন তাঁদের সে মনোবৃত্তিকে তিনি 'পরাধীনতাসুলভ হীনম্মন্যতা'র পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের জঞ্জাল ভারাক্রান্ত বাংলা ব্যাকরণ পুস্তককেও কতকাংশে দায়ী করেছেন, শিক্ষার্থীদের মনে যা 'সহজেই বিভীষিকার সৃষ্টি' করে। (*মো.হা.চৌ.র./*২, পৃ. ২০১)

পরিভাষার প্রয়োজন ও তা তৈরির উপায় সম্পর্কেও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতামত ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। এ বিষয়ে ১৯৬১ সালে এক প্রবন্ধে ('বাংলা ভাষা কি দুর্বল?') লিখেছেন, 'পরিভাষা কিছু কবিতা বা চিত্রশিল্প কিংবা সখের বাগানও নয় যে,

লোকে কেবল অকারণ মনের আনন্দে শুধু পরিভাষার সৃষ্টি করে যাবে। বাংলায় যদি বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য উচ্চতর জ্ঞানের অধ্যাপনা আরম্ভ হয়, তখন শিক্ষক এবং গ্রন্থকারগণ নিজেদের প্রয়োজনেই পরিভাষা সৃষ্টি করে নেবেন।' (*মো.হা.চৌ.র.*/২, পৃ.১৯৩) এবং '... এ্যাটম, ইলেকট্রন, প্রোটন, রকেট, ডিনামাইট, গ্যাস ইত্যাদি শব্দ বাংলায় গ্রহণ করা যেতে পারে; কারণ এগুলির বাংলা করাও মুশকিল আর করলেও সেগুলি ঠিক অর্থবোধক হবে না। তবে অনেক শব্দই ইচ্ছে করলে বাংলায় অনুবাদ করা যেতে পারে ...। কিন্তু এ জন্য সবচেয়ে বেশী দরকার বাংলা শব্দগঠন (morphology) পদ্ধতির জ্ঞান।' (*মো.হা.চৌ.র.*/২, পৃ. ১৯২)

৭

শান্তিনিকেতনের রাবীন্দ্রিক পরিবেশে, উপরন্তু প্রবোধচন্দ্র সেন, অনিলকুমার চন্দ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্র-অনুরাগী ও বিশেষজ্ঞজনের সান্নিধ্যে মানসিক পুষ্টি ও বিকাশ ঘটার ফলে স্বাভাবিক যে, পরবর্তী জীবনে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মানসচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ানো ছাড়াও, এবং হয়তো কতকটা সেই সুবাদেও তিনি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বেশকিছু প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রথম পর্যায়ে লেখা এরকম বারটি প্রবন্ধ নিয়ে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *রবি-পরিক্রমা* বইটি। আ. ন. ম. বজলুর রশীদের *রবীন্দ্রনাথ* (১৯৬১)-এর পর এটিই ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ। বইয়ের প্রবন্ধগুলো অনেকটা পরিচিতিমূলক। এককথায় সূত্রবদ্ধ করতে চাইলে, প্রবন্ধগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়, রবীন্দ্র-অনুরাগরঞ্জিত। বইয়ের মুখবন্ধে লেখক নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'একজন সাধারণ সাহিত্য রসিক হিসেবে'। আর রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে তাঁর বিনীত উচ্চারণ : 'আমরা যারা উপর উপর রবীন্দ্রকাব্যের রঙ্গীন পরাগই শুধু গায়ে মাখলুম কিম্বা হাত বাড়িয়ে তার শীতল স্পর্শটুকু পেয়ে খুশী হয়ে উঠলুম, তারাও ধন্য।' (*র.প.*, পৃ. ৩) তবে এই বইটিতে যেমন, তেমনি পরবর্তীকালেও বিশেষ করে পাকিস্তানি শাসক এবং সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারণার মোকাবিলা করতে গিয়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে কিছু প্রবন্ধ লিখতে হয়। 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক' (*সমকাল*, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮), 'রবীন্দ্রনাথের সার্বজনীনতা (দ্বিতীয়ার্ধ)' (*ইত্তেফাক*, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮), 'সুরের মুক্তি' (*ইত্তেফাক*, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৩) 'রবীন্দ্রনাথ ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা' (*ইত্তেফাক*, ২৫ বৈশাখ ১৩৭৬) তাঁর এমন কয়েকটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িকতা, তাঁর মানবধর্ম এবং বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের অপরিহার্যতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আর তা করতে গিয়ে, হয়তো সময়ের বাস্তবতা বিবেচনায়ই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকেও, আরো অনেকের মতো, রবীন্দ্রনাথ যে আসলে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন,

হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের অনেক তফাত, ব্রাহ্মরা পৌত্তলিকতা বিরোধী, চেতনাগতভাবে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বজনীন মানবধর্মের অনুসারী ছিলেন, পিতা দেবেন্দ্রনাথের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের মানস-গঠনে যে সুফিবাদের প্রভাব ছিল, এসব যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে। যেমন, একটি উদাহরণ :

> জন্ম থেকেই তিনি [রবীন্দ্রনাথ – মো.শ.হা.] ছিলেন পৌত্তলিকতা-বিরোধী ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত। তাঁর ধর্মগুরু রামমোহন আর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন গভীরভাবে ইসলামের ধর্মীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এবং সেইহেতু নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী, উপরন্তু দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই ছিলেন সুফী সাধক কবি হাফিজের পরম ভক্ত। ...
>
> ... কোনো দেব-দেবীর বন্দনাগান তিনি একটিও লেখেননি, যদিও অনেক মুসলমান কবিই তা লিখেছেন। ('সুরের মুক্তি', (*মো.হা.চৌ.র./*১, পৃ. ২৭-২৮)

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথ যে গান্ধীসহ হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় বাস্তববাদী মনোভঙ্গি পোষণ করতেন, ইতিহাসের সত্য ও সামাজিক বাস্তবতা বিচারে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন, তার উল্লেখ করে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে লেখা তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক' প্রবন্ধে (*রবি পরিক্রমা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) মন্তব্য করেছেন : 'হিন্দু নেতাদের মতো রবীন্দ্রনাথ এই [হিন্দু-মুসলমান – মো.শ.হা.] সমস্যাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে বা ধামাচাপা দিতে চাননি।' (*মো.হা.চৌ.র./*১, পৃ. ৭৬) এবং 'গান্ধীজী ধর্মের নাম করে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র মেলাতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ও মত-পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে, এদের মধ্যেকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে, দুই-এর মধ্যে মৈত্রী (ঐক্য নয়) প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।' (ঐ, পৃ. ৮৬) জিন্নাহর চৌদ্দ দফা দাবি পেশেরও 'অন্তত কুড়ি বছর' আগে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন', এবং 'হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যকে বাস্তব সত্য বলে মেনে' 'এই সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকার বিরুদ্ধে' ও 'কোনোরকম জোড়াতাড়া দিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করার বিরুদ্ধে' বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন' বলেও একই প্রবন্ধে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন (ঐ, পৃ. ৭৮)। তাঁর মতে উপমহাদেশের মুসলমানরাও কেউ দেশভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা ভাবার আগেই, ১৯১১ সালে, রবীন্দ্রনাথ 'তাঁর দূরদৃষ্টির দ্বারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, কী হতে যাচ্ছে এবং কী হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।' (ঐ, পৃ. ৯৬)

নীতিগত এবং কৌশলগত বা অন্যকথায় রক্ষণাত্মক অবস্থান থেকে শুধু যে নিজেই তিনি প্রবন্ধ লিখে পাকিস্তানি শাসক ও পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের রবীন্দ্রবিরোধী প্রচারণার জবাব দিয়েছেন তাই নয়, রবীন্দ্র শতবর্ষে *আজাদ*-এর সঙ্গে *ইত্তেফাক*-এর সেই সুবিদিত বাহাসকালেও আহমেদুর রহমানকে (ভীমরুল) তথ্য যুগিয়ে *আজাদ*-এর

সমালোচনার জবাব দিতে সহায়তা করেছেন বলে জানা যায়। (সন্‌জীদা খাতুন, আকরম : ৭৫)

পাকিস্তান পর্বে সাম্প্রদায়িক মহলের উদ্যোগে ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাবার, তাঁকে মুসলিম পুনর্জাগরণের বা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টারও শক্ত জবাব দিয়েছেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁর লেখায়। তথ্য দিয়ে তাঁদের যুক্তির অসারতা তুলে ধরেছেন এভাবে :

> পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলে আপনারা যাঁকে বরণ করে নিয়েছেন, আমাদের সেই প্রিয় কবি নজরুল ইসলামকেই ধরুন। তাঁর সাহিত্যই কি তবে আপনাদের তামদ্দুনিক সাহিত্যের নমুনা? আনুন তাঁর সাহিত্য। খুলে দেখুন তাঁর বিখ্যাত গানের বই বনগীতি (যাতে বেশি সংখ্যক ইসলামী গান রয়েছে। ওর যে পৃষ্ঠায় আছে 'হে মদিনার বুলবুলি গো' তার সামনা-সামনি পৃষ্ঠায়ই দেখুন 'কালা, এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা?' যে পৃষ্ঠায় আছে 'দীন দরিদ্র কাঙ্গালের তরে ... হে হযরত' তার বিপরীত পৃষ্ঠায় দেখুন 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়,' ঠিক তেমনি 'পাঠাও বেহেশত হতে' এবং 'জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী'। আরও দেখুন এক পৃষ্ঠায় রয়েছে 'মোহাম্মদ মোর নয়নমণি' উল্টো পৃষ্ঠায় 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী'। আবার 'মোহাম্মদ নাম জপেছিলি' এবং 'কে বাজিয়ে চলে বাঁশী, বিশ্বরাধা ঐ সুরে উদাসী'। আর কত উদাহরণ দেব? এর কোন্‌টা ফেলে কোনটা রাখবো? নজরুলেরই একটা গান মনে পড়ে গেল. 'হেড মাস্টারের টেড়ি, সেকেণ্ড মাস্টারের দাড়ি কারে রাখি কারে ছাড়ি?' (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ৩৬৭-৬৮)

সওগাত পত্রিকায় (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০) প্রকাশিত তাঁর 'সংস্কৃতি সংকট' প্রবন্ধ থেকে উপরের উদ্ধৃতিটি দেওয়া হলা।

৮

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের পটভূমিতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এর বিরোধিতাকারীদের বক্তব্য খারিজ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি, দিনটিকে জাতীয় উৎসব হিসেবে পালনের আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন :

> প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যময় জীবনধারা আছে। ইহাই তাহার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি লইয়া যদি সে বাঁচিতে না পারে তবে উহা সেই জাতির পক্ষে পরাধীনতা। পারসিক জাতি যদি নওরোজ উৎসব করিতে পারে তবে আমরা বাঙালীরা পহেলা বৈশাখ করিতে পারিব না কেন? ... পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় উৎসব হিসাবে গৃহীত হোক – ইহাই আমাদের কামনা।
>
> এক পক্ষ হইতে কথা উঠিবে বাঙলা বর্ষ হিন্দু সাল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বাঙলা সন হিজরী সনেরই রূপান্তর মাত্র। (*মো.হা.চৌ.র./১*, পৃ. ৪৭০-৭১)

দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০) সৈয়দ মুজিবুল হক 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাস' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যাতে এই সিলেবাসে পাকিস্তানি বা ইসলামি তাহজীব-তমদ্দুনের স্থান যথেষ্ট পরিমাণে না থাকা এবং 'হিন্দুয়ানি' ও 'ভারতী মার্কা কালচারে'র প্রভাবের অভিযোগ করা হয়। প্রবন্ধটি পড়ে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী একই পত্রিকায় ও একই শিরোনামে সে অভিযোগের জবাব দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি 'হিন্দু-মুসলমান বিচার না করে' সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই আমাদের 'গৌরবময় উত্তরাধিকার' হিসেবে গ্রহণের কথা বলেছিলেন। (*মো.হা.চৌ.র./*১, পৃ. ৪৭০-৭১) পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলায় বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরোধ-বিতর্কটা যেসব বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হতো তার মধ্যে প্রধান একটি ছিল এই ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার নির্ণয়ের প্রশ্ন। এ-সম্পর্কে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট :

> বাঙ্গালী হিসাবে আমাদের যে একটি সত্তা আছে, তার ধারাবাহী সংস্কৃতি বা সাহিত্যকে আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। সেই কারণেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে 'হিন্দুয়ানী' [,] 'ভারতী মার্কা' বা হিন্দুর লেখা বলে কোনো সাহিত্যকে আমরা বর্জন করতে পারি না এবং বাংলা সাহিত্যকে তেমন করে ভাগ করাও চলে না। স্বভাবতঃই এ সাহিত্যের বেশীর ভাগই 'হিন্দুয়ানী'। কেননা লেখক যাকে হিন্দুত্ব বলেছেন – সেটা এদেশেরই সংস্কৃতি। যেমন পারস্য সাহিত্যে রয়েছে অগ্নিপূজকদের সংস্কৃতি। তাছাড়া, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী-মুসলমানীত্বে বড় মেশামেশি হয়ে গেছে, একথা যিনি বাংলা সাহিত্যের ভিতরকার খবর রাখেন, তিনিই স্বীকার করবেন। বাউল, মুরশিদী, পীরের গান, পাঁচালী, ভাটিয়ালী, জারীগান – এদের কতটা মুসলমানী, কতটা হিন্দুয়ানী, সেটা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। (*মো.হা. চৌ.র./*২, পৃ. ১৩-১৪)

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের জন্য তাদের মুসলমান পরিচয়ের পাশাপাশি বাঙালি পরিচয়টিও যে সত্য, সে-সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহর অভিমত উদ্ধৃত করে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লিখেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের [বাংলা] সিলেবাস সম্পর্কে লেখক [সৈয়দ মুজিবুল হক – মো.শ.হা.] যে প্রশ্ন তুলেছেন, তার সঙ্গে এই মৌলিক তত্ত্বটা জড়িয়ে আছে বলে এতগুলি কথা বলতে হল।' (*মো.হা. চৌ.র./*২, পৃ. ১৩)

এখানে উল্লেখ করা হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৯৪৯ সালের ১১ মে শান্তিনিকেতন থেকে ঢাকায় আশরাফ সিদ্দিকীকে লেখা এক চিঠিতে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তখনকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিলেবাসকে 'অত্যন্ত ভালো' বলে মন্তব্য করেছিলেন। (সিদ্দিকা : ২৩)

৯

১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ 'ধর্ম ও সংস্কৃতি' নামে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাদের জানামতে মৃত্যুর আগে এটিই তাঁর শেষ প্রকাশিত প্রবন্ধ। এতে তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির আলাদা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যে-কথাগুলো ইতঃপূর্বে তিনি তাঁর অন্য প্রবন্ধেও খানিকটা অন্যভাবে বলেছেন। তবে এ প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য অনেক স্পষ্ট বা সরাসরি, হয়তো সময়ই যাকে সম্ভব করেছে। তিনি লিখেছেন :

> ... ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এক নৌকায় চাপিয়ে দিলে এ দু'য়ের মধ্যে সংঘাত বাধা অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতি একটি বহমান ধারার মতো; তার উৎসমুখ যে অতীতের কোন্ গুহা-গহ্বরে লুক্কায়িত আছে, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ করে বা বিশেষ কোন একটা সময়ে একটা বিশেষ ধর্মের রীতি-নীতিকে রাষ্ট্রধর্মরূপে অঙ্গীকার করে তাকে সর্বাত্মক জীবন-পদ্ধতি (Total code of life) বলে চালিয়ে দিলে, অতীতের এই বহমান সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (*মো.হা. চৌ.র.*/২, পৃ. ৮১)

এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে আরেকটি তাপর্যপূর্ণ তথ্য হলো, এতে তিনি 'বাঙালির নবজাগরণের মন্ত্র' হিসেবে 'জয় বাংলা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তখন পর্যন্ত আমাদের আর কোনো বিশিষ্ট লেখক বা বুদ্ধিজীবীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ রচনায় এই শ্লোগানটি অন্তত এমন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রবন্ধের সেই শেষ অনুচ্ছেদটি এখানে পুরোই উদ্ধৃত করা হলো :

> কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতোই আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিপর্যয় কম ঘটেনি। অনেক দুর্যোগ আর ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। তাই আমাদের সংস্কৃতি-বৃক্ষও আজ পত্র-পুষ্পশূন্য ডালপালা ভাঙা ঝড়ে পতিত মহিরুহের মতো। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আজও তার মূল কাণ্ডটি জীবন্ত রয়েছে। তার প্রমাণ 'জয় বাংলা' মন্ত্রে বাঙালীর নব-জাগরণ। আজকের মুক্ত আকাশে নবীন সূর্যোদয়ে নতুন প্রাণশক্তি আহরণ করে আমাদের সংস্কৃতি-বৃক্ষ নতুন পত্র-পুষ্পরাজিতে শোভিত হয়ে তার পূর্ণ ফলবান সত্তা অর্জন করবে এই কামনাই করি। (*মো.হা. চৌ.র.*/২, পৃ. ৮৩)

১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে, ৫ মার্চ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে লেখক ও কারুশিল্পী পরিষদ আয়োজিত প্রতিবাদী সভায় মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী একটি স্বরচিত কবিতাও আবৃত্তি করেন। সমাবেশে উপস্থিত ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর সেদিনের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করে পরে লিখেছেন :

> অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সকলের মতো তিনিও বেশ উত্তেজিত ছিলেন, উত্তেজিতভাবেই দু'চার কথা বলে অকস্মাৎ পকেট থেকে

> একটা কবিতা বার করে পড়তে শুরু করলেন। বহু সভা-সমিতিতে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে শুনেছি, কিন্তু কখনো নিজের লেখা কোন কবিতা পড়তে দেখিনি। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কবিতাটি কাব্যমূল্যে হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু বক্তব্য তীক্ষ্ণ। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবর্গের উদ্দেশ্যে ছন্দোবদ্ধে তিনি বলেছিলেন যে কবি, শিল্পী সুকুমার শিল্পের সাধক ইত্যাদি বলেই বাঙ্গালীর পরিচয়, কিন্তু এবার 'দেখবে কেমন বাঙ্গাল মার'। (আকরম : ৮৪)

কাছাকাছি সময়েই দৈনিক *পূর্বদেশ*-এর প্রশ্নের জবাবে মোফাজ্জল চৌধুরী এদেশের নাম 'বাংলাদেশ' করার পক্ষে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। (সনজীদা, আকরম : ৭৭)

১০

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এক যুক্তিশাসিত, সহনশীল ও সম্প্রীতিময় সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। যেখানে তর্ক হবে, কিন্তু মতামতের কারণে কেউ কাউকে শত্রুজ্ঞান করবে না। *সাহিত্যের নবরূপায়ণ* (১৩৭৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আমাদের সাহিত্য' প্রবন্ধে (প্রকাশ : দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) তিনি লিখেছিলেন :

> আমার সঙ্গে মতের অমিল কারুরই হবে না এ আশা করিনে; কিন্তু কারো যদি ভিন্নমতই থাকে, তিনি আমাকে সোজাসুজি দুশমন আখ্যায়িত না করে তাঁর মতটাও যুক্তি প্রমাণসহ উপস্থিত করবেন বলেই আশা করি। (পৃ. ১৭)

অথচ ব্যক্তিজীবনে নিরীহ ও নির্বিবাদী মানুষটিকে কেবল তাঁর মতামতের জন্যই বিরোধীদের চোখে 'দুশমন' হিসেবে পরিগণিত হতে হলো। বধ্যভূমিতে ছাত্রস্থানীয় কিছু দুর্বৃত্তের নৃশংসতার শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হলো তাঁকে।

সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষটি ফুল খুব ভালোবাসতেন। অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিমের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, মৃত্যুর আগের শরতেও বিভাগের সহকর্মীদের জন্য রুমাল ভরে শিউলি ফুল নিয়ে এসেছিলেন। (আকরম : ৪) পূবাইলে নিজের জমিতে ফুলের চাষ এবং ঢাকায় ফুলের দোকান করতে চেয়েছিলেন। জীবনকালে তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু আজ বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবেই ফুলের চাষ হচ্ছে। শহরের নানা জায়গায় অনেক ফুলের দোকান। শান্তিনিকেতনের ধরনে প্রাকৃতিক পরিবেশে নবীন শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। সে স্বপ্ন হয়তো অন্য কারো হাতে বাস্তবায়িত হয়েছে বা কখনো হবে। তবে যে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্ন তিনি দেখতেন, বধ্যভূমিতেও যে স্বপ্ন হয়তো তাঁকে নিরুদ্বিগ্ন রেখেছিল, সেই স্বপ্ন সফল করতে আমাদের বর্তমান ও

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত করাবার কোনো বিকল্প নেই। আমরা কি সে দায়িত্ব পালন করতে পারছি?

গ্রন্থপঞ্জি

আকরম হোসেন [সম্পা.], ১৯৭২। *মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান [সম্পা.], ১৯৭৮। *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী* খণ্ড ১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান [সম্পা.], ১৯৮২। *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী* খণ্ড ২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিদ্দিকা মাহমুদা, ১৯৮৭। *মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা